তৃতীয় অধ্যায়

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা এবং রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি

ভুটানের সঙ্গে কোচ রাজ্যের প্রথম যুদ্ধের মধ্য দিয়েই কোচ রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কোচ-ভুটান যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, বিনিময়ে কোচ রাজ্য হয়ে পড়ে করদমিত্র রাজ্য। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আর কোচ রাজ্য তার স্বাতন্ত্রতা হারায়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা প্রসারের উদ্দেশ্যও সফল হয়। যুদ্ধের খরচ সহ রাজ্যের অর্ধেক কর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খাতে জমা পড়ার চুক্তি সাক্ষরিত হয় কোম্পানির শর্ত অনুসারেই। বলা যেতে পারে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যে ব্রিটিশ ক্ষমতা সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল এই চুক্তি। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের এই চুক্তি ছিল এক রাজনৈতিক সংকটের ফসল। ভুটান যেমন মহারাজা দেবেন্দ্র নারায়ণের (১৭৬৩-১৭৬৫ খ্রি:) আমল থেকে কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তেমনি বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত বংশও কোচ রাজ্যের অধীনতা অস্বীকার করতে থাকে। ইতিমধ্যে ভুটান কৌশলে ভোজসভার আমন্ত্রণ জানিয়ে মহারাজা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ ও দেওয়ান দেওকে বন্দী করে নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় রাজ্যের নাজির দেও খগেন্দ্রনাথ মহারাজাকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সাহায্য প্রার্থনা করে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শর্ত সাপেক্ষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়। চুক্তি অনুযায়ী কোচ রাজ্য অর্ধেক কর দিতে সম্মত হয়। জোন্সের নেতৃত্বে ভুটান রাজের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে এবং জিম্পে নিহত হন। সে সময় ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন গভর্ণর জেনারেল। মহারাজা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণও মুক্তি পান। কোচ রাজ্যের শেষ স্বাধীন রাজা ছিলেন কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ। চুক্তি বলে রাজনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গ্রহণ করে। যদিও অভ্যন্তরীণ, প্রশাসনিক বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা রাজাকে দেওয়া হয়। কিন্তু কোম্পানি ধীরে ধীরে রাজস্ব আদায়ের হাত ধরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ক্ষমতা বিস্তার করে এবং

বলা যায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উভয়ক্ষেত্রেই কোচ রাজবংশ স্বাধীনতা হারায়।

ইঙ্গ-কোচ চুক্তির শর্তগুলি কোচ রাজ্যের স্বাধীনতার পরিপন্থী ছিল। স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোম্পানীর 'প্যারামাউন্ট পাওয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যের এবং রাজার মুক্তি এসেছিল কোচবিহার রাজ্যের স্বাধীনতার মূল্যে।[১] চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে কোচবিহার কোম্পানির করদমিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। মহারাজা ধরেন্দ্র নারায়ণই ছিলেন প্রথম করদ রাজা।[২] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করেই সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তবে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধিই ছিল মুখ্য। ভুটানকে করিডোর করে তিব্বতে বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোই ছিল তাদের মূল অভিপ্রায়। আবার কোম্পানি অধিকৃত এলাকার নিরাপত্তার বিষয়েও চিন্তা করে। কোচবিহার রাজ্যে ভুটানের আধিপত্য বিস্তারের পর থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রংপুরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়। কোচবিহার রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলার উত্তর সীমান্তে কোম্পানির নিরাপত্তায় সমস্যা তৈরি করতে পারে এই আশঙ্কায় ওয়ারেন হেস্টিংস সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সম্মত হন।[৩] কোম্পানির কোচবিহার চুক্তির আরেকটি কারণ হল সন্ন্যাসী আতঙ্ক। রংপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া জেলার সীমান্তে তখন সন্ন্যাসীদের তাণ্ডব অসহনীয় ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। চুক্তি করে কোচ সেনাবাহিনীতে এবং রাজকীয় রক্ষী বাহিনীতে সন্ন্যাসীদের নিয়োগ কোম্পানি বন্ধ করতে চেয়েছিল।[৪] সন্ধিপত্রে যে শর্তগুলি ছিল তার মধ্যে অন্যতম হল কোচবিহার রাজ্য শত্রুমুক্ত হলে রাজা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করবেন এবং তার রাজ্যকে বঙ্গদেশের সহিত সংযোজিত হতে দেবেন। শর্তে লেখা ছিল "That the Rajah will acknowledge subjection to the English East India Company upon his country being cleared of his enemies and will allow the Coochbehar Country to be annexed to the province of Bengal.[৫]

ব্রিটিশ কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার আগে কোচবিহার রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা তেমন কঠোর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মিশ্র শাসন ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। রাজার ভাবনা ছিল আইনের উর্দ্ধে। এক সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আদল লোকজনের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভুটিয়া এবং কোচ ভাবনার মিশ্রণে তৈরি একটা শাসনব্যবস্থা, সবকিছুই রাজার হিসাবে পরিগণিত হত। তবে স্ট্যাম্প আইন সম্পর্কে ধারণা ও আপিল সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থা এখানে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত

ছিল। রাজকর্মচারীদের মধ্যেও উদাসীনতা ও ঢিলেঢালা মনোভাব ছিল। রাজ্যের প্রশাসনের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত অন্যের অধীনে সঠিকভাবে কাজ করার মানসিকতা ছিল না। রাজা ছাড়া কোন কর্তৃপক্ষকেই স্বীকার করতেন না।[৬]

ব্রিটিশ সরকার সূচনা পর্ব থেকেই বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে। কোচবিহার দেশীয় রাজ্যের আংশিক আধিপত্য কায়েম করার পর অন্যান্য এলাকা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সম্পদ সম্ভাবনা ও বাণিজ্য বিস্তারকে সামনে রেখেই ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা সূচিত হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানির পদ প্রাপ্তির পর থেকেই ব্রিটিশ আধিপত্যের সূত্রপাত ধরা যায়। বস্তুত ১৭৬৫ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি অর্ধশতাব্দীকাল বাংলায় মাৎস্যন্যায় চলছিল।[৭] এই সময় বাংলাদেশ জুড়ে এক নতুন জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এদের অধিকাংশই ছিল বেনিয়ান ও কোম্পানির উপর মহলের প্রিয়পাত্র। দেবী সিংহ ছিলেন এই সময়ের একজন নির্মম ও অত্যাচারী ইজারাদার ও ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রিয় পাত্র। বৈকুণ্ঠপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চল সহ রংপুরের ইজারাদার হয়ে তিনি অতিমাত্রায় রাজস্ব আদায়ে প্রজা নিগ্রহ শুরু করেন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র রংপুর, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রজা বিদ্রোহ শুরু হয়। বস্তুত বাংলার এই প্রান্তদেশে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে কোম্পানির নির্মম রাজস্ব ব্যবস্থার প্রতিবাদস্বরূপ।[৮] এই রংপুর বিদ্রোহ ছিল কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের (কোচ, রাজবংশী প্রভৃতি) ক্ষাত্রবীর্যের ও সংগঠন শক্তির শেষ পরিচয়।[৯] বাংলার অভ্যন্তরস্থ সমতলবাসীগণ বহুদিন যাবৎ মুসলমানদের পদানত ছিল, কিন্তু মেদিনীপুর জেলার চুয়ারগণ এবং কোচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশী, মেচ ও কোচরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। তাই তারা অতি বিক্রমে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সিপাহীদের সঙ্গে সমানে লড়তে পেরেছিল।[১০] অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রংপুর, বৈকুণ্ঠপুর ও কোচবিহার ভূখণ্ড জুড়ে বিভিন্ন হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে। সন্ন্যাসী ফকিরদের অত্যাচার, নেপালের গোর্খাদের অত্যাচার সেই সঙ্গে ভুটিয়াদের সমতলে আগমন, আক্রমণ ও লুঠতরাজ। সর্বোপরি কোচবিহার, ভুটান এবং বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে বিবাদ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন সব মিলিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রজাবৃন্দের সমাজ জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ইঙ্গ-কোচবিহার

সন্ধির শর্তানুসারে সংকোশ নদী থেকে তিস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চল (পশ্চিম দুয়ার) যা কোচবিহার রাজ্যের অংশ যে অংশটি ভুটান দখল করে রেখেছিল সেই অংশটি ভুটানকে দিয়ে দেওয়া হয়। আদপে ওয়ারেন হেস্টিংসের ভুটান সরকারের প্রতি এই তোষণ নীতি এক গুরুতর রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল। তিব্বতের সম্ভাব্য স্বর্ণখনি ও বিপুল বাণিজ্য সম্ভাবনাই ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস এর আসল লক্ষ্য। এই তোষণ নীতি ব্রিটিশ সরকার বহুদিন বজায় রেখেছিল।

ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে ব্রিটিশ সরকারের কিছু নীতি আয়োগের ফলে। ব্রিটিশ সরকার ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে জমি জরিপের ব্যবস্থা করে এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে। মূলত: সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সর্বাধিক কর আদায়ের ব্যবস্থা করা। ফলে কৃষকদের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়। নিজের জোতের আয়তন বৃদ্ধির জন্য অন্য কারো জমি আত্মসাৎ থেকে পতিত, অনাবাদী জমিকে চাষযোগ্য করে তোলবার প্রয়াস শুরু হয়। অনেকে এইভাবে বড় বড় জোতের মালিক হয়ে ওঠে। অনেকে গ্রামের বাইরে নিজস্ব জোত বা খারিজ মহলের মালিক হয়ে ওঠে, আবার ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয়। উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে জমিদার না হলেও বড় বড় জোতদারির সূচনা হয়। নির্দিষ্ট রাজস্ব নির্ধারিত সময়ে জমা দিয়ে বংশ পরম্পরায় ভোগ দখলের অধিকার পায়। এই জোতদারদের নিয়ন্ত্রণে চুকানিদার, দার চুকানিদার, প্রজা, আধিয়ারদের নিয়ে গ্রাম সমাজের পত্তন ঘটে। এই পরিবর্তিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং বলা যেতে পারে শ্রেণি বিভক্ত বর্ণ হিন্দু ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। অনাবাদি জঙ্গলময় পতিত জমিও স্থায়ী কৃষিকার্যের জন্য উদ্ধার হয়। বৃহত্তর কৃষক সমাজের সূচনাও হয় বলা যেতে পারে। বিবর্তনের হাত ধরে ধীরে ধীরে সম্প্রদায় ভিত্তিক ভূমি মালিকানা থেকে গুরুভার খাজনার বিনিময়ে ব্যক্তিগত মালিকানা স্থানলাভ করে। ভূমি মালিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকতার দিকে যেমন এগোয় কৃষিকে ঘিরে অর্থনীতির বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভবও হয়। আর রাজবংশী সমাজও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়। বাস্তুভিটা, ব্যক্তি মালিকানা, লাঙল দিয়ে স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। পারিবারিক শ্রম দান ও প্রয়াসের মধ্য দিয়ে পরিবারের স্থায়ী ঠিকানা, কৃষিভিত্তিক আচার সংস্কারের ব্যাপ্তি পায়। সেইসঙ্গে

পারিবারিক বৃত্ত তৈরি হয়। ফসলের বৈচিত্র্যও আসতে থাকে। অন্যান্য শ্রেণির সঙ্গেও সমন্বয় ঘটে। বিবর্তন পরিবর্তনের ধারাও চলতে থাকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়কালে রাজবংশী সমাজ এই কৃষি সংস্কারকে ভিত্তি করেই একপ্রকার সংগঠিত হয়।

প্রথম কোচ ভুটান যুদ্ধের পরও উত্তর সীমান্তের বিস্তৃত অঞ্চলে শান্তি কিন্তু ফিরে আসে না। উপরন্তু ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের (১২ নভেম্বর) দ্বিতীয় কোচ-ভুটান যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। স্বাভাবিকভাবে বিস্তৃত ডুয়ার্স (পশ্চিম) এলাকা সহ জলপাইগুড়ি অঞ্চলে সমাজ সংস্কৃতি এক অস্থির বিপন্নতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। বলা যেতে পারে ঔপনিবেশিক শাসনের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য এই অঞ্চলকে সুদীর্ঘকাল ক্ষতবিক্ষত করে। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ২য় ভুটান-কোচ যুদ্ধের পর সমগ্র বাংলা দুয়ার ব্রিটিশ সরকারের অধিকারভুক্ত হলে 'পশ্চিমদুয়ার' অঞ্চল গঠিত হয়।[১১] তিনটি মহকুমা —সদর মহকুমা ময়নাগুড়ি, দ্বিতীয় মহকুমা প্রধান শহর আলিপুরদুয়ার এবং তৃতীয় মহকুমা ছিল ডালিমকোট। এই ডালিমকোট মহকুমা তিন বছর বাদে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি এই আলিপুরদুয়ার এবং ময়নাগুড়ি মহকুমার সঙ্গে জেলার অধীন জলপাইগুড়ি মহকুমা এবং তিস্তার পূর্ব ও পশ্চিমপার অঞ্চল যুক্ত করে জলপাইগুড়ি জেলা গঠন করে ব্রিটিশ সরকার।[১২]

কোম্পানি প্রথমদিকে সাধারণ প্রশাসন ও রাজস্ব প্রশাসন আলাদাই রাখে। কিন্তু তাতে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণও নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে থাকে। এই সময়ই গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। বেন্টিঙ্ক গর্ভণর জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই প্রশাসন ব্যবস্থা সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিসের প্রবর্তিত কাঠামো নতুন করে ঢেলে সাজান। প্রথমেই যে সংস্কারের কাজটি তিনি করেন সেটি হল District Magistrate এবং Collector-এর পদ দুটিকে সমন্বিত করে নাম দেন District Magistrate and the Collector। ফলে এই পদের ক্ষমতা ও গুরুত্ব বেড়ে যায়। আর এদের কাজকর্ম দেখভালের জন্য কমিশনারের পদ তৈরি করেন। এই কমিশনের জন্য তিনি আবার Division বা বিভাগ তৈরি করেন। এই বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় কমিশনারকে। তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন আইন বহির্ভূত কাজকর্ম। সেই সূত্রেই তৈরি হয় প্রেসিডেন্সি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ ও বর্ধমান বিভাগ। এই বিভাগ সৃষ্টি সম্পর্কে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক মাহবুব রহমানের মন্তব্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন "১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকালে কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। প্রতিটি বিভাগের শাসনভার একজন বিভাগীয় কমিশনারের ওপর অর্পিত হয়। বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন জেলা কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী। ১৮২৯ সালের আইনে কমিশনারকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। তার হাতে রাজস্ব, বিচার ও পুলিশের সর্বময় ক্ষমতা অর্পিত হয়।"[১৩]

ঔপনিবেশিক শাসন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকারের নানাবিধ পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে ব্রিটিশ সরকারের বাণিজ্য ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে। পরিবর্তন হয় জনবিন্যাসের। সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র ছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। ইংরেজদের দ্বারা প্রবর্তিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে নতুন নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। উত্তরবঙ্গেও এর প্রভাব পড়েছিল। ভূমি রাজস্ব বা জমি থেকে উদ্বৃত্ত আয় লাভ করার জন্য ইংরেজরা কোথাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে, কোথাও বা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত এবং মহলওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এলাকা এবং দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকায় non-regulatory ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, এর বাইরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় জমিদাররা ছিল জমির মালিক। আবার non-regulated এলাকায় সরকার নিজেই ছিল জমির মালিক। এখানে জোতদারদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত জমি চাষ করার জন্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকা এবং non-regulatory এলাকা সব জায়গাতেই জমিকে কেন্দ্র করে জমির উদ্বৃত্ত লাভের জন্য একাধিক 'মধ্যস্বত্ব ভোগী' শ্রেণির সৃষ্টি হয়। যেমন — জোতদার, মুলনদার, চুকানিদার, দর-চুকানিদার, দর-দরচুকানিদার ইত্যাদি। এইসব মধ্যস্বত্ব ভোগীরা নতুনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠলে প্রকৃত কৃষক — যারা জমি চাষ করত এবং আধিয়াদের উপর শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়।[১৪]

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠার ফলে নতুন করে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা তৈরি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উত্তরবঙ্গের দেশীয় বা স্থানীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি বিশেষ লক্ষ করা যায় না। স্বাভাবিকভাবে উত্তরবঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল বহিরাগত বণিক গোষ্ঠী। এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছিল মাড়োয়ারীরা। এই মাড়োয়ারীরাই ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলার অন্যান্য প্রান্তের মত উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। মাড়োয়ারীরা ছাড়াও পার্সিরা ব্যবসা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছিল। এছাড়া পূর্ববঙ্গ থেকে সাহা, কুণ্ডু, বণিক প্রভৃতি পদবিধারী বাঙালীরা উত্তরবঙ্গে হাজির হয়।[১৫]

ঔপনিবেশিক পর্বে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও অর্থনীতিতে চা-চাষ এক বিরাট প্রভাব ফেলে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি সিকিমের কাছ থেকে দার্জিলিং লাভ করে এবং ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ডুয়ার্স এলাকা ব্রিটিশ সরকার ভুটানের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিজেদের দখলে নেয়। উল্লেখ্য দার্জিলিং নামের শহর ও জেলাটি ইংরেজ শাসকদের তৈরি। সিকিম রাজ্যের নিকট দার্জিলিং পাহাড় ও তরাই সমতল এবং ভুটানের কাছ থেকে কালিম্পং পাহাড় নিয়ে কোম্পানি দার্জিলিং জেলা তৈরি করে।[১৬] দার্জিলিং তাই সম্পূর্ণভাবে ঔপনিবেশিক শহর। এই দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স এলাকা ইংরেজরা লাভ করার পর এখানকার জমিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে। তারা সার্ভে এবং সেটেলমেন্টের কাজ শুরু করে কিছু জমিতে চুক্তির ভিত্তিতে 'জোতদারি'র ব্যবস্থা করেন। এই জমি লাভ করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর মানুষ আসতে শুরু করে। তারা জমি লাভ করে জোতদারে পরিণত হয়। কৃষি কাজের উপযোগী জমি ছাড়া ডুয়ার্সে এবং দার্জিলিং জেলায় পার্বত্য এলাকায় প্রচুর মালিকানাবিহীন জমি ছিল, যার বেশিরভাগটাই ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই এলাকার সরকারই ছিল জমির মালিক এবং সরকার নিজেই জমি দিতে শুরু করে চা-চাষ করার জন্য। এরপরে ডুয়ার্স অঞ্চলে দ্রুত চা বাগান গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গাজোলডোবায় চা-বাগান স্থাপিত হওয়ার মধ্য দিয়েই যার সূত্রপাত ঘটে বলা যায়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সেখানে চা বাগানের সংখ্যা দু'শো ছাড়িয়ে যায়।[১৭] আগমন ঘটে হাজার হাজার বহিরাগত মানুষের। চা বাগানে কাজ করার জন্য ম্যানেজার, করণিক, অফিসার শ্রেণির মানুষের আগমন ঘটে। শ্রমিক বা কুলি হিসাবে প্রচুর

আদিবাসী মানুষকে ধরে আনা হয়। এদের বেশিরভাগই ছিল ওঁরাও, সাঁওতাল, মুন্ডা, হোঁ, নাগেশিয়া বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ। এইসব আদিবাসী মানুষদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে সর্দাররা কমিশনের বিনিময়ে সাঁওতাল পরগণা, রাজমহল, ছোটনাগপুর, রাঁচি থেকে ধরে নিয়ে আসে। আর তরাই ডুয়ার্সে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের তরল বাণিজ্য বিস্তারের দীর্ঘপথ রচিত হয়।

ঔপনিবেশ ও উত্তর-ঔপনিবেশ পর্বে উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল, দক্ষিণাংশের মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর সেভাবে পায়নি। এটা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময় থেকে অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে এটা তারা ঘটায় মূলত: ভূমি রাজস্ব নীতি এবং সেটা সম্পদ সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে। উত্তরবঙ্গের তথাকথিত দক্ষিণাংশের গৌরবময় সময় ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগ। বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মতো উত্তরবঙ্গের সমস্ত এলাকায় একইরকম ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রয়োগ করেনি ব্রিটিশ সরকার। দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, মালদহ, জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তার পশ্চিমাঞ্চল জমিদারি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। আবার জলপাইগুড়ি এলাকার ডুয়ার্স এলাকায় এবং দার্জিলিং জেলায় non-regulatory ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সরকার নিজেই সেখানে সরাসরি জমির মালিক। এই জমির লিজ দিত অর্থনৈতিক স্বার্থে। কোথাও জোতদারি ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল আবার কোথাও চা-বাগান গড়ে উঠেছিল লিজের মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক শাসনের এই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় অনেক নতুন নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। এদের মধ্যে হাজার হাজার একর জমির মালিক যেমন ছিল তেমনি কয়েকশ' বিঘার মালিক হিসাবে ধনীক শ্রেণির জোতদার বা মধ্যস্বত্ত্বভোগীরও সৃষ্টি হয়। অনেকে আবার জমিদার, জোতদারদের কাছে জমি নিয়ে আধিয়ার দিয়ে জমি সত্ত্বের ভোগ দখল করতেন। অনেকের কৃষির সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না। এরা মূলত: কমিশনের মাধ্যমেই জমি চাষের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী, মহাজন বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থেকে আধিয়ার মারফতই জোতদারি চালিয়ে যেতেন। জোত কেনাবেচায় এরাই মূল ভূমিকা পালন করতেন। এই অনুপস্থিত জোতদাররা একসময় বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। দিনাজপুর জেলাতেও এরকম মধ্যস্বত্ত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব হয়। এফ. ডব্লিউ. স্ট্রং লিখেছেন, "Owing to the trouble and expense involved in realising rents, the loss

suffered owing to cultivators deserting their holdings, the large area over which the tands included in a estate are sometimes scatered and other causes, it frequently happens that a zaminder keeps only a small portion of his estate in his own management, and lets out the rest either in parces on lease or in farm sometimes the whole estate is so let out.”[১৮] এভাবেই সৃষ্টি হয় মুকারারি তালুকদার, পাটানি, তালুকদার, ইজারাদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্ত্বভোগীর।

প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির প্রধান উপাদান ছিল কৃষি। এখানকার জনসমাজের এক বৃহৎ অংশই ছিল রাজবংশী এবং স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। এদের বেশিরভাগই ছিলেন কৃষির সঙ্গে জড়িত। কেউবা ছিলেন জোতদার-জমিদার, কেউবা ছিলেন মধ্যস্বত্ত্বভোগী কৃষক, আবার কেউবা ছিলেন আধিয়ার বা সাধারণ কৃষক।[১৯] আবার উত্তরবঙ্গের স্থানীয় জমিদার বা জোতদার বা মধ্যস্বত্ত্বভোগী এবং তাদের অধঃস্তন কৃষক বা আধিয়াররা ছিলেন একই সম্প্রদায়ভুক্ত। যেমন রাজবংশী, স্থানীয় মুসলিম বা আদিবাসী জোতদার বা মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের প্রজা বা আধিয়াররাও ছিলেন রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত।[২০] এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের মত এই এলাকার স্থানীয় জোতদাররা অন্যান্য পেশায় বা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। শুভজ্যোতি রায় তার ‘Transformation on the Bengal Frontier, Jalpaiguri’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষরা কৃষি ছাড়া অন্যান্য পেশার সঙ্গে সেভাবে যুক্ত ছিলেন না।[২১] এমনকী সমাজের প্রয়োজনীয় কাজ বা পেশা যেমন দোকানদার, ধোপা, নাপিত, খেয়া পারাপার প্রভৃতি কাজও তারা করতেন না। বিহার বা অন্যান্য প্রান্তের লোকেরা এসে এসব কাজ করতেন।[২২] সে সময়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু, রেললাইন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজেও বাইরে থেকে লোক আনতে হয়।

পশ্চিম ডুয়ার্স ছিল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। লোক সংখ্যা ছিল খুবই কম। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারিতে এইচ. বেভারলি লিখেছিলেন “In the recently acquired Doors the population is 67 to the squire mile.” ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির প্রতিবেদনেও ও’ ডোনেল লিখেছেন যে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে আলিপুরদুয়ার মহকুমার প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ছিল ৫৭ জন এবং ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮৯ জন।[২৩] আসলে রাজনৈতিক

ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনবিন্যাসের চরিত্র পাল্টাতে থাকে। বিশেষ করে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন পর্বে। এই বিস্তৃত অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল রাজনৈতিক টানাপোড়েন ছিল। কোচ রাজ্যের অংশ হলেও ভুটান জোর করে একশ বছরের বেশি সময় ধরে তা ভোগ দখল করে। এইসব অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন বলবৎ হওয়ার পর বহু রাজবংশী কৃষক এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। প্রতিবেশী কোচবিহার দেশীয় রাজ্য ও রংপুর থেকেও ভালো সংখ্যক রাজবংশী কৃষক ডুয়ার্সের এলাকায় চলে আসে। এর কারণ হিসাবে জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনারের ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে .... in the Western Doors portion of the District the area under rice cultivation was very considerably extended, owing to the influx of new settlers from CoochBehar and Ranpur District."[২৪] আবার ডুয়ার্সের জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ আবাদের উদ্দেশ্যেও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অংশ থেকে লোকজন আনার চেষ্টা করে সর্দার মারফত। আসলে ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি। কিন্তু ডুয়ার্সের অনাবাদি জমি থেকে কিছু রাজস্ব পাচ্ছিলেন না। ঔপনিবেশিক চিন্তায় তাই লোকবসতি বৃদ্ধি করে জঙ্গল পরিষ্কার ও চাষাবাদ বৃদ্ধি করে রাজস্ব আদায়ের প্রয়াস। এই সূত্রেই ডুয়ার্স এলাকায় জনবসতি বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গে চা বাগান, ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থেও বহু মানুষের আগমন ঘটে। আবার ঔপনিবেশিক মানসিকতায় প্রশাসনিক কারণেও তারা বিভিন্ন শ্রেণির লোকজনকে নিয়ে আসেন। এভাবেই ব্রিটিশ সরকার তাদের উদ্দেশ্য সফল করেন। সেই শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তারা বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাগুলির একাধিকবার সীমানা পরিবর্তন করেন। ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব সংগ্রাহক হিসাবে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের বাঙালিদের আগমন ঘটে। আবার চা-বাগান, কাঠের ব্যবসা, পাটের ব্যবসা ও রেলপথ বিস্তারের হাত ধরে বহু মানুষের আগমন ঘটে এবং বসবাসের জায়গা হয়ে ওঠে। শিলিগুড়ি ও তরাই অঞ্চলের সঙ্গে বিহারের যোগাযোগ তো ছিলই, রেললাইন স্থাপনের পর সেই যোগাযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

১৮৯১-১৯২১ সালের অভিবাসনের চিত্র (কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর) [২৫]

সাল	সন্নিহিত জেলা থেকে অভিবাসন		অন্যান্য জেলা থেকে অভিবাসন	
	পুং	মহিলা	পুং	মহিলা
		কোচবিহার জেলা		
১৮৯১	১২৯৯৭	১৫১৯১	৩২৬২	১২০১
১৯০১	৯১৬১	১২৫৩১	১২৬৬৮	২২৫৫
১৯১১	১১০০০	১৩০০০	৫০০০	২০০০
১৯২১	৯০০০	১২০০০	১০০০	৬০০০
		জলপাইগুড়ি		
১৮৯১	৩০৯২০	২৭৮৩৫	১২৪৬১	৭৬৪১
১৯০১	২৪৩৫৪	২৩৮৫৬	৬৫২৭২	৪৮৬৩৬
১৯১১	১৮০০০	১৫০০০	১৫০০০	১০০০০
১৯২১	২১০০০	১৯০০০	৫০০০	৪০০০
		দিনাজপুর		
১৮৯১	২২৬৭০	১৮৮১৯	৯৩০৮	৫৮৯৪
১৯০১	১৩৯০১	১৩৩১৯	৬০১৪৩	৩৪৮৭১
১৯১১	১৯০০০	১৬০০০	১২০০০	৬০০০
১৯২১	১২০০০	১৩০০০	১০০০০	৭০০০

সূত্র : A. Mitra, West Bengal District Hand Book, Calcutta 1851, Cooch Behar, Page - xxxvi; Jalpaiguri, Page - xii; West Dinajpur, Page - xii.

ঔপনিবেশিক শাসনকালে সামাজিক ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। একাধিক Settlers townও তৈরি হয়। জলপাইগুড়ি জেলা সৃষ্টির পর ইংরেজদের দ্বারা সৃষ্ট নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার, চা-বাগান স্থাপিত হওয়ার ফলে চাকুরি এবং ব্যবসা সূত্রে বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের ও শ্রেণির মানুষের সমাগম ঘটে এই জেলায়; ফলে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয় ঔপনিবেশিক যুগে। ১৮৮১ খ্রি. থেকে ১৮৯১ খ্রি. আদমসুমারি রিপোর্টের তুলনামূলক সূচক থেকে লক্ষ্য করা যায় ডুয়ার্সে এই দশকে ১,১৪,২৭৭ জন অভিবাসিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। টেবিলে তা দেখানো হল। [২৬]উত্তর ঔপনিবেশিক যুগেও এই ধারা বজায় ছিল।

জায়গা	বৃদ্ধির পরিমাণ	জায়গা	বৃদ্ধির পরিমাণ
দার্জিলিং	১৫৮৮	বিহারের জেলা	৮৪৯১
দিনাজপুর	৫০৫	উড়িষ্যা	২৯২
রংপুর	১০১০১	ছোটনাগপুর	২০৩৪১
কুচবিহার	৩২২২৪	অন্যান্য রাজ্য	২৯৩৭১
অন্যান্য জেলা	১১৩৬৪		
		মোট	১১৪২৭৭

সূত্র : Sunder's Report; Gruning, Jalpaiguri District Gazetteers; Census Statistics, 1881 and 1891.

উত্তরবঙ্গে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল অনেক দেরিতে। এখানকার দেশীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার সচেতনতাও ঘটেছিল অনেক পরে। তবে পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হাত ধরেই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগৎ বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। তবে এই ক্ষেত্রে স্থানীয় জোতদাররা অর্থ, শ্রম, জমিদান এবং উদ্যোগ গ্রহণ করে শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এখনও খোঁজ নিলে তাই দেখা যায় যে অধিকাংশ বিদ্যালয় স্থাপনে রাজবংশী জোতদার কিংবা অবস্থাপন্ন পরিবারই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অনেক বিদ্যালয়ের নামের মধ্যেও সেটা বোঝা যায়। এ বিষয়ে মুসলিম জোতদার ব্যক্তিরাও পিছিয়ে ছিলেন না। আসলে উত্তরবঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। একদিকে দেশীয় বিদ্যালয়ে দেশীয় শিক্ষা (সংস্কৃত টোল, পাঠশালা) এবং মুসলমানদের মক্তব ও মাদ্রাসা অপরদিকে ইংলিশ স্কুলগুলিতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন শুরু হয়েছিল। ফলে উত্তরবঙ্গের মাটিতে একটি শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব হয়। শিক্ষক, উকিল, অধ্যাপক, ডাক্তার, কবি, লেখক প্রমুখ মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই অংশটি যারা সমাজের এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে।[২৭] বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। মনন, চিন্তনের ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ঢেউ আঁচড়ে পড়ে। তবে শিক্ষার বিষয়ে রাজবংশী সমাজের সচেতনতা জাগ্রত হয় তারও অনেক পরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শিক্ষা বিষয়ে ভাবনার পরিবর্তন স্পষ্ট হয়। কৃষি নির্ভর মানসিকতার বদল ঘটতে থাকে। অন্যান্য পেশায় যুক্ত হবার প্রবণতা ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। জমিদারী মানসিকতার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার কারণে অনেকের জোতদারি

সংকটাপন্ন হয়। এক প্রতিযোগিতারও সম্মুখীন হয়। পাশাপাশি বড় পরিবারগুলোও ভাঙতে থাকে। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও প্রভাবিত হয়। আত্তীকরণ, হীনমন্যতাবোধ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে সংস্কৃতির বিন্যাসে পার্থক্য চোখে পড়তে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি। প্রথম দিকে কোম্পানি শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিল না, কারণ তারা মূলত: এসেছিল ব্যবসা বাণিজ্য করতে। তাই শিক্ষা খাতে অর্থব্যয় করা তাদের কাছে ছিল অপচয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্বও এসে পড়ে, আর প্রশাসনিক কাজ চালাতে গিয়ে তাদের ইংরেজি জানা লোকের প্রয়োজন হয়। কাজেই ইচ্ছে না থাকলেও প্রয়োজনের তাগিদেই তারা শিক্ষা বিস্তার ঘটাতে বাধ্য হয়। তবে এ প্রসঙ্গে বলা ভালো যে সরকারিভাবে দেরিতে শিক্ষা প্রবর্তিত হলেও বেসরকারি উদ্যোগে বিশেষ করে মিশনারীদের উদ্যোগে এদেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে।[২৮] বলা যেতেই পারে ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্র ধরেই মিশনারীদের আগমন ঘটে এবং তারাই শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একপ্রকার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। একটা বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, তবে বলা ভাল রাজবংশী জনগোষ্ঠী অনেক দেরিতে এই শিক্ষা চেতনার অংশীদার হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদেও রাজবংশী সমাজে শিক্ষার হার শূন্যর কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মনীষী পঞ্চানন বর্মা ও কতিপয় বুদ্ধিজীবী মানুষের ক্ষাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজবংশী সমাজে শিক্ষা সচেতনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে শিক্ষার প্রসারে মহারাজারা বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তবে ব্রিটিশের করদরাজ্যে পরিণত হওয়ার পরই কমিশনারদের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হয়। জেনকিন্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এবং সুনীতি একাডেমী স্থাপিত হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। শিক্ষার প্রসারে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার বরাবরই অগ্রসর ছিল। সেটাও কিছুটা ঔপনিবেশিকতার বাহ্যিক প্রভাব বলা যায়।[২৯]

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলা গঠনের পর শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। এই জেলার প্রাচীন ও মধ্যযুগে শিক্ষার অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট

গেজেটিয়ার-এ এ বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায় — The cencus of 1872, which is the earliest, recorded 19 primary schools having 283 students and 22 teachers. The first High English School of the District namely the Jalpaiguri Zilla School was established in 1876. In 1875-76 there were 153 schools with 3263 students on the rolls. The everage number of square miles to each school was 18,992 and the percentage of school to population was[৩০] এরপরে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রাইমারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। প্রথম কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। The college named Ananda Chandra College started functioning from 1942 with a roll strength of 91 which figures of 211 next year and 582 in 1947. B.A. classes were opened in 1948.[৩১]

অন্যান্য জেলার মত দিনাজপুর জেলাতেও ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে সরকারি উদ্যোগে শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি। শিক্ষা বলতে সাধারণত পাঠশালায় শিক্ষাই বহাল ছিল। মুসলমান শিক্ষার জন্য ছিল মক্তব। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সরকারি উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। এ বিষয়ে F. A. Strong র বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। In 1860-61 only 10 schools in the Dinajpur District were in receipt of aid from the state. Between that year and 1870-71, the number to 247, of which one was a Government English school, 8 were Government Vernecular Schools, 18 were aided girls schools and one an aided training school.[৩২] এরপর থেকে সরকারি উদ্যোগে দিনাজপুর জেলাতে আরও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

মালদহ জেলাতে দেশীয় শিক্ষাই বহাল ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। হিন্দুদের টোল ও মুসলমানদের জন্য ছিল মক্তব। ধর্মভিত্তিক শিক্ষাই প্রাধান্য পেত। টোল এবং পাঠশালাগুলিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সংস্কৃত শেখানো হত। মক্তবগুলিতে শেখানো হত পার্শী ভাষা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সরকারি উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু হয়। G. E. Lambourn লিখেছেন, In 1836-57 there were two Government

aided vernacular school with 117 scholar and in 1860 one of these schools was converted into a middle English school, the total number of scholars being 169. In 1870 there were four English schools and 14 vernacular schools either maintained or aided by Government. In 1872 when sir George compbell's scheme for Education was introduced, 179 schools were brought under Government supervision with 4207 pupils.[৩৩] কোচবিহারের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তদনুরূপ। কোচবিহারে জেনকিন্স স্কুল স্থাপিত হয় মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের আমলে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এবং ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গের প্রথম কলেজ বলা যায়। স্বাধীনতার পূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয় তো উত্তরবঙ্গে ছিল না। সুদূর কলকাতাতেই উচ্চশিক্ষার জন্য ছুটতে হত। রাজবংশী সমাজের শিক্ষা সচেতনতা দেখা যায় অপেক্ষাকৃত জোতদারদের মধ্যে। দরিদ্র কৃষক আধিয়ারদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটে অনেক পরে। সেটাও স্বাধীনোত্তর সময়ে। তবে এ বিষয়ে মনীষী পঞ্চানন বর্মার ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তার নেতৃত্বে ক্ষাত্র আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা সচেতনতার প্রসার ঘটে। শুধুমাত্র শিক্ষা নয় এই সময়েই বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মনন ভাবনা, খাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ এমনকী সংস্কৃতি চেতনার মধ্যেও পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়। তবে এ বিষয়ে 'ক্ষত্রিয় সমিতি' ও পঞ্চানন বর্মার ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আত্মসচেতনতার মধ্য দিয়ে আত্মানুসন্ধান ও আধুনিক জীবনের পথ ও অনুসন্ধানের প্রয়াস গতি লাভ করে এবং একটা প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে উত্তরণের পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে। বলা যায় ঔপনিবেশিক সময়ের শেষ দিকেই রাজবংশী জনগোষ্ঠী আত্মসচেতন ও সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে।

ঔপনিবেশিক সময়ের পূর্বে বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গ ভৌগোলিক দিক থেকে যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তেমনি বিভিন্ন জনজাতির সমষ্টি ছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত এইসব জনজাতি যথা - মেচ, কোচ, রাভা, গারো, পুলিন্দ, টোটো প্রভৃতি যারা ব্রিটিশ আসার বহু পূর্ব থেকেই এখানে বসবাস করত। পরবর্তীকালে অভিবাসী জনজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী (মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, রাই, লিম্বু, শেরপা প্রভৃতি) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার হাত ধরে আসে। এছাড়া পূর্ববঙ্গ থেকে কিছু বাঙালি,

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন শ্রেণির ব্যবসায়ী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করত। এছাড়া ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। তবে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জনজাতির মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হিসাবে বসবাস করত। এর ফলে তাদের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় সংস্কার, চিন্তাভাবনায় মিশ্রণ বিশেষ ঘটে না। আবার বহিরাগত কোন গোষ্ঠী বা জাতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতাও ছিল না। এছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, শিক্ষার সুযোগ না থাকা ইত্যাদি কারণে সামাজিক রীতিনীতির বিশেষ পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তন হওয়ার পরই রাজনৈতিক ক্ষমতা বদল, নতুন অর্থনীতি, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ও শিক্ষার আগমনের ফলে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়।

সবাই প্রায় গ্রামেই বসবাস করত এবং বেশিরভাগ অঞ্চলই ছিল জঙ্গলে আবৃত। কোন কোন এলাকা ছিল বন্য জন্তু জানোয়ারদের অভয়ারণ্য। দিনের বেলাতেই সেইসব হিংস্র পশুদের লোকালয়ে আগমন ঘটত। বিভিন্ন জনজাতি পাহাড় জল-জঙ্গল আবৃত এলাকায় বসবাস করলেও রাজবংশী জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত সমতল এলাকাতেই পাড়া-টারী তৈরি করে বসবাস করত। কৃষিজমিকে ঘিরে কোন বাড়িকে কেন্দ্র করে (জোতদার) পাড়া-পড়শি, আধিয়ার-প্রজাদের বসবাসই ছিল স্বাভাবিক বিষয়। ব্রিটিশ সময়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জনবসতি সম্পর্কে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, সে সময় এক একজন জোতদারকে কেন্দ্র করেই গ্রামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা দীক্ষা এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি আবর্তিত হত।[৩৪] আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জোতদার এবং আধিয়াররা একই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় বিশেষ শ্রেণিভেদ যেমন ছিল না তেমনি আত্মীয়তার বন্ধনও তৈরি হত। ফলে সমাজ ব্যবস্থায় সমবায় ভিত্তিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটত।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় জাতির লোক বলে মনে করেন।[৩৫] তবে তাদের আত্মপরিচয় যাই হোক না কেন তাদের মধ্যে কোন জাতিভেদ প্রথা ছিল না। তবে জীবিকার ভিত্তিতে সমাজে কয়েকটি শ্রেণিবিভাগ ছিল। এদের মধ্যে সব চাইতে প্রভাবশালী ছিল জোতদার শ্রেণি।[৩৬] এরাই ছিল জমির মালিক এবং এরাই রাজবংশী সমাজের অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতি, বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন।[৩৭] এই জোতদাররা অন্যান্য শ্রেণির লোক যেমন ছোট কৃষক, আধিয়ার, পুরোহিত এবং তাদের গৃহে কর্মরত কোন

মানুষকে ছোট চোখে দেখতেন না। এমনকী পরবর্তীকালে দক্ষিণবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষজনের সঙ্গেও সহৃদয় ব্যবহার করতেন এবং সদ্‌ভাব বজায় রাখতেন । অন্য একটা শ্রেণি যারা রাজবংশী সমাজে পূজা পার্বণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদেরকে 'অধিকারী' বলা হত। সমাজের লোক এদেরকে 'কুলগুরু' হিসাবে সম্মান করতেন। তারা যজমানীও করতেন। শিষ্যত্বও প্রদান করতেন। আবার এদের মধ্যে যারা শ্রাদ্ধের কাজ করতেন তাদেরকে বলা হত 'দেওসী'। এছাড়া ছিল 'দেওধা' নামে আরেক ধরনের পুরোহিত শ্রেণি। এদের পদবির বিশেষ কোন পরিবর্তন হত না, এরাও পূজা অর্চ্চনার সঙ্গে যুক্ত ছিল।[৩৮]

রাজবংশী সমাজে বর্ণভেদ ছিল না। কৃষি সম্পৃক্ত সবাই মিলমিশের মধ্যেই লোকায়ত সমাজ গঠন করতেন । এমনকী ধর্মান্তরিত নস্য শেখ মুসলিমদের সঙ্গে সামাজিকতার ক্ষেত্রে কোন ধর্মান্ধতা ছিল না। মুসলিমদের কিছু জীবিকা ভিত্তিক কাজকর্ম নির্দিষ্ট (যেমন মাংস বিক্রয়, গবাদি পশুর ব্যবসা বাণিজ্য) থাকলেও সামাজিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ বিভেদ ছিল না। গ্রাম সমাজের কোন সমস্যার সমাধানে একযোগে সবাই যেমন অংশগ্রহণ করত তেমনি গান বাজনা (বিশেষ করে দোতরা, কুশান, পালাটিয়ায়) কিংবা সংস্কৃতি উৎসবে সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করতেন । এমনকী পূজা-পার্বণেও কোন বিধিনিষেধ কাজ করত না। মুসলিমদের গান বাজনা ধর্মের শরিয়ত বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হলেও আব্বাসউদ্দিন, নায়েব আলির মত প্রখ্যাত গায়করা এই প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল উপেক্ষা করেই ভাওয়াইয়া গান করতেন এবং বলা যেতে পারে তাঁদের উদ্যোগেই ভাওয়াইয়া গান বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হয়। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অন্যান্য পেশার লোকজন যেমন ব্রাহ্মণ, ধোপা, নাপিত, কামার প্রভৃতি শ্রেণির আগমন ঘটলে তাদের সঙ্গেও একটা পারস্পরিক মেলবন্ধন তৈরি হয়। ভাষার ক্ষেত্রেও তারা সবাই শরিক হয়ে ওঠে। আচার বিচার সংস্কারেও কাছাকাছি আসে। নগদ বিনিময়ের বদলে কিছু কিছু বাড়িতে বাৎসরিক ধান শস্যের বরাদ্দ হত কাজের নিরিখে। স্বাভাবিকভাবে তারা সবাই রাজবংশী সমাজের অংশ হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে রাজবংশী সমাজের মন্দির, থানে বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বিশেষ অংশ নিতেন না। কারণ যে সকল ব্রাহ্মণ রাজবংশী সমাজের পূজা-পার্বণ কিংবা শ্রাদ্ধাদির কাজ করতেন বর্ণ হিন্দুদের চোখে তারা নিম্ন শ্রেণি হিসাবে পরিগণিত হত। এই সুযোগে অসমীয়া ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটে। তাঁদের বংশধররাই

এখনও রাজবংশী সমাজের পূজা-পার্বণ কিংবা বিয়ে, শ্রাদ্ধের মত অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নেয়। ব্রিটিশ সরকার আসার পর সেই বিধিনিষেধ অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক পর্বে এক একটি গ্রামে লোকসংখ্যা বিশেষ ছিল না।[৩৯] গ্রামগুলি গ্রাম প্রধানের দ্বারা শাসিত হত এবং এক্ষেত্রে পঞ্চ (পঞ্চায়েত) নামে একপ্রকার গ্রাম্য সংস্থার ব্যবস্থা ছিল। গ্রাম প্রধান এবং পঞ্চ উভয়েই পরোক্ষভাবে জমিদারের অধীনে থাকত। এরা নির্বাচিত হতেন না, হতেন মনোনীত।[৪০] গ্রামের বাড়িগুলি সারিবদ্ধভাবে অথবা একত্রে ছিল না, ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কারণ হিসাবে বলা যায় গ্রামের বেশিরভাগ ভূ-সম্পত্তির মালিকানা ছিল জোতদার শ্রেণির হাতে। এই সকল জোতদারদের জমিগুলি বেশিরভাগ একস্থানে হত আর জোত-এর মাঝখানে বাড়ি তৈরি হত। সুতরাং প্রায় দেখা যেত এক জোতদারের বাড়ি থেকে অন্য জোতদারের বাড়ির দূরত্ব ছিল কমপক্ষে আধমাইল থেকে একমাইল।[৪১]

জনবসতি কম থাকায় রাত্রি বেলা গ্রামের রাস্তা নিরাপদ ছিল না। নিরাপত্তার কারণে লোকজনও বিশেষ বের হত না। বেশিরভাগ এলাকা ছিল জঙ্গলে আবৃত এবং হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের উপদ্রবে পূর্ণ। তাছাড়া চোর ডাকাতেরও ভয় ছিল। হাট বাজার গুলিও দিনের বেলায় বসত। সন্ধ্যার আগেই শেষ হত। হাট বাজারগুলি শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনেই নয় সামাজিক মেলবন্ধন, খবরাখবর আদান প্রদানেরও কেন্দ্র ছিল। গ্রামের হাটগুলিতে প্রচুর চায়ের দোকান এবং খাদ্যদ্রব্যের দোকান থাকত। হাট থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গ্রামবাসী সংগ্রহ করত। হাটবাজারের বাইরে বিশেষ দোকানপাট ছিল না। রাজবংশী সমাজের মানুষেরা বাঙ্কুয়া (ভারবাহী বাঁশের তৈরি ভার বিশেষ) নিয়ে জিনিসপত্র হাটে আনা নেওয়া করতেন । অনেকে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নরা গরু বা মোষের গাড়িতে হাটে জিনিসপত্র নিয়ে যেতেন । বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের অঙ্গ 'হাটঘুরানী' রীতি ছিল। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজার করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচার বা জানানোর কাজটি হাটেই শেষ হত। বাঁশ খেলার দল, তিস্তা বুড়ির পূজা, ভক্তিয়ার খেলা, চড়ক মাগনের দল বাজারে যেত। দলবদ্ধ হয়ে হাট বাজার যাওয়ার বিষয়টি উৎসবের মত ছিল। বয়স্কা মহিলারাও হাটে দলবেঁধে যেতেন।[৪২] মহিলারা 'আলোয়া' (দেশী তামাক) সিলিমে করে খেতেন । রাজবংশী সমাজে যৌথ পরিবার লক্ষ করা যেত। জোতদার শ্রেণির মধ্যে বিরোধ ছিল না। গ্রামগুলির নামকরণও হত সেই গ্রামে বসবাসকারীদের প্রকৃতি অনুযায়ী।[৪৩] ১৮৮৫-

৮৯ খ্রিস্টাব্দের সান্ডার্স-এর রিপোর্টে দেখা যায় যে গ্রাম এলাকার নামে নামে স্থানিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষ কোন ব্যক্তির নামে জনপদগুলির নাম স্থিরীকৃত হয়েছে। এটা জলপাইগুড়ি, বিস্তীর্ণ তরাই ডুয়ার্স এমনকী দিনাজপুর, মালদহ এলাকাতেও দেখা গেছে।[৪৪] সে সময় এভাবেই স্থানের নাম স্থির হত। রাজবংশী মানুষজন নদীর কিংবা মাছের, গাছের নামে, অনেক সময় উৎপাদিত ফসলের নামেও জায়গার নাম ঠিক করতেন। যেমন - মরিচবাড়ী, তল্লিগুড়ি, চ্যাংমারী, হলদিবাড়ি কিংবা চাপরের পার। জয়দেবপুর, কুমারগ্রাম, ভোলার ডাবুরী কিংবা আমগুড়ি এই নামগুলি থেকে সেটা স্পষ্ট হয়।[৪৫] শিক্ষার বিষয়ে রাজবংশী মানুষজন বিশেষ সচেতন ছিলেন না। সুযোগও ছিল না বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কিছু এলাকায় দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কিন্তু সেখানেও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞানের পরই বিদ্যালয় ছেড়ে দিত। আসলে ভূমিজ রাজবংশী সমাজে চাকরিবাকরি বা অন্য পেশার প্রতি কোন আগ্রহই ছিল না। জমিই ছিল সামাজিক মর্যাদার প্রতীক। সরকারি চাকুরিকে তারা দাসত্ব হিসাবেই ভাবতেন। প্রচলিত প্রবাদ ছিল ‘‘চাকরির ভাত মাথাত হাত।’’ সেটারই প্রতিফলন ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকায় চা বাগানের পত্তন হলে। বাইরে থেকে বিভিন্ন শ্রেণির লোকজন আসেন, তারা ব্রিটিশ কোম্পানির চা বাগানে নাম লেখান। কিন্তু বৃহত্তর রাজবংশী সম্প্রদায় বিমুখ হয়ে থাকে। এছাড়া সে সময় সরকারি চাকুরিতে বেতন ছিল সামান্য, বাড়ির বাইরে গিয়ে না থাকার মানসিকতা ইত্যাদি কারণে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠেনি।[৪৬]

ঔপনিবেশিক পর্বে সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস শুরু হলেও চিকিৎসার বিষয়ে রাজবংশী মানুষজন সহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীরা সম্পূর্ণভাবে থেকে লোক চিকিৎসার উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। ওঝা, কবিরাজ, দাই, বৈদ্য এরাই বিভিন্ন গাছগাছড়ার শেকড়-বাকর, পাতা, ছাল দিয়ে চিকিৎসার কাজ করতেন। কখনও কখনও মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার প্রচলন ছিল। ভূত, প্রেত, ঠাকুর, দ্যাওর প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য ‘ভৌরিয়া’ শ্রেণির লোকজনের দ্বারস্থ হতেন। পূজা-পার্বণ, মানতের বিষয়টি তো ছিলই।[৪৭]

রাজবংশী সমাজ কৃষিকাজের সঙ্গে শুধু যুক্ত ছিল না সমস্ত লোকায়ত ভাবনার মধ্যেই কৃষি সম্পৃক্ততাকে লালন পালন করত। কৃষিকৃত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে তো বটেই অন্যান্য ধর্ম

কর্মাদি, দেবদেবীর আধার সবেতেই কৃষি, উর্বরা ভাবনা জড়িয়ে আছে। দেবদেবীর প্রকারভেদেও জীবনাচরণের সুখ শান্তি তথা যৌথ সমাজভাবনা প্রকাশ পায়। সংসার, পরিবারে মহিলাদের প্রতি গুরুত্ব মাতৃতান্ত্রিকতা ভাবনাকে স্মরণ করায়। মহিলাদের প্রতি অনেক ক্ষেত্রে শিথিলতা ছিল। পর্দা প্রথা ছিল না, বিধবা বিবাহও প্রচলিত ছিল, সতীদাহ প্রথা ছিল না। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কার উদ্যোগের আগেই বিধবা মহিলা পছন্দ করে স্বামী নির্বাচন করে বিবাহ করতে পারতেন । যা 'ডাঙ্গুয়া' হিসাবে পরিচিত ছিল। মেয়ের মাকে পণ দিয়েই বিয়ে করতে হত। ঘর জামাই হিসাবে থেকে বিয়ে ('ঘর জেয়া') করার রীতি ছিল। আবার পছন্দের স্বামী নির্বাচন করে তার সংসারে থাকার রীতিও প্রচলিত ছিল। এই ঘর সোন্ধানী বিয়েতে সমাজ স্বীকৃতিও দিত। 'ফুল বিয়া' ঘটা করে সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি এই ধরনের বিয়েগুলিকেও সমাজ মেনে নিত। সমাজে কিছু বিধিনিষেধ থাকলেও নারীদের স্বাধীন মতামত নেওয়ার সুযোগ ছিল বইকি। যদিও পুরুষদের মধ্যে একাধিক বিয়ের প্রচলন ছিল। মেয়েদের বিয়ে হত কম বয়সে ১০-১২ বছর বয়সে। কিন্তু বাপের বাড়িতে আরো কিছুটা সময় (ঋতুমতী হওয়া অবধি) থাকার রীতি প্রচলিত ছিল। মহিলারা বাড়ির কাজের পাশাপাশি জমির কাজকর্মেও (রোয়া লাগানো, ধান কাটা, নিড়ানী ইত্যাদি) অংশ নিতেন । নিজের পরিবারের কাপড় নিজেরাই তৈরি করে নিত । মেয়েদের পোষাক ছিল পিরান, গোঞ্জি, মহিলাদের ফোতা, অগান, বুকুনী, পাটানি ইত্যাদি। ব্লাউজ পড়ার প্রচলন ছিল না। ফতা পাটানী হিসাবেই পরিচিত। স্থানভেদে নাম পরিবর্তন হয়েছে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলায় 'ফোতা' হিসাবে পরিচিত হলেও কোচবিহার, নিম্ন অসমে 'পাটানী' নামটিই বেশি ব্যবহৃত হয়। বিবাহিত মহিলারা এবং বয়স্করা এই পাটানী পড়তেন । হাঁটুর উপর থেকে বুক পর্যন্ত আড়াই হাত চওড়া, চার হাত লম্বা হত এই পাটানী। অসমের রাজবংশীরা এখনও এই পাটানী বেশি ব্যবহার করে। পাটানী নিয়ে চারুচন্দ্র সান্যালের বক্তব্য উল্লেখ্য — "A Rajbanshi women is happy with 'Phota'. This is coloured cloth of five cubits long and 2½ cubits wide. This she ties just above the breast and it hang down up to the knees. The two ends of the 'Phota' are not seen together. It is an open cloth. Withen the last ten years 'phota' is going out of the market." [৪৮] স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এই ফোতার বহুল ব্যবহার ছিল।

তারপরেই আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ফোতার ব্যবহার কমে যায়। ততদিনে বাইরের মিলের কাপড়ও হাটে বাজার আসতে থাকে। এই ফোতারও বহুপ্রকার ভেদ ছিল। প্রায় ১৫ প্রকারের ফোতার খোঁজ পাওয়া যায়। তবে সব উজ্জ্বল রঙের হত। আদতে ইন্দোমঙ্গোলয়ের গ্রুপের প্রায় সব জনজাতিই উজ্জ্বল রঙিন কাপড়-চোপড়ই পছন্দ করে। ১) ঘুনি বা ভুনি, ঢালা, ঢালাকালা, বুলুকঢালা, মালদৈ তেরোইফুলি, চিকনপাইর, ডোরাডুরি, সাদা, ঘুঘুপারী, ছটাপারী, সূর্যাপুরী, চারকানা (চেক) নাইবা চোতারী, গুটাওঠা।[৪৯] সৈস্যাফুলি ফোতার বিশেষ কদর ছিল। বিশেষ করে বিয়ের সময়। ঘুনি ফোতা ঘন সবুজ রঙের নীল পাড়। মালদৈ ফোতা মালদহ নামের সঙ্গে যুক্ত। বড় পাটানীও (৬ হাত লম্বা, সাড়ে তিন হাত চওড়া) অনেকে ব্যবহার করতেন । বিশেষ করে আসামে। প্রত্যেক বাড়িতে 'তানশালা' (তাঁত) ছিল।[৫০] প্রত্যেক মহিলাই তাঁত চালিয়ে কাপড় বানাতে জানতেন। পরবর্তীকালে বসাক পদবির তাঁতিরা ফোতা হাটে বাজারে নিয়ে আসতেন এবং মিলের ফোতাও বাজারে এসে যায়। রাজবংশী সমাজের এই কাপড় চোপড় ব্যবহারের মধ্যে নৃ-গোষ্ঠীগত আদিম কৌম ভাবনার পরিচয় নিহিত আছে। এই ফোতা গোঞ্জি কাপড় নিয়ে বহু গানও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত।

ছাওয়ার বাদে জেজেংগা গোঞ্জি
মাইয়ার বাদে কিনেক মন তুই
মালদই পাটানী।

তেমনি

চ্যাড়া বান্দার বুনি ফতা মইধ্যে আঙা ডোর
ক্যানেরে চেঙেরা পাক পাড়েছিস ভাতার আছে মোর।

আবার গানে পাওয়া যায় —

মৈস্যাফুলি জাঙিয়া
ডেডেংকালী কালো
দেখিবার বড় ভালো
মইধ্যখানে ঠক্ ঠক্।

গ্রাম এলাকায় পুরুষরা গতানুগতিক পোষাক-আশাকই পড়তেন কিন্তু বাইরে গেলে ধুতি পাঞ্জাবি

ব্যবহার করতেন। মাঠে-ঘাটে কাজে কর্মের সময় ছোট কাপড় কোমরে গুঁজে পড়তেন যা ‘নেংটি’ হিসাবে পরিচিত। উল্লেখ্য এই ‘নেংটি’ কিন্তু সবসময়ের পোষাক নয়। এই নেংটি নিয়ে বিভ্রান্তিকর কিছু বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রে উঠে এসেছে। যা প্রকৃতপক্ষে ভুল ভাবনা কিংবা না বোঝার জন্যই হয়েছে। জুতার কোন ব্যাপার ছিল না তবে অনেকে খড়ম ব্যবহার করতেন এবং মহিলারা ‘চোপর’ (স্যান্ডেল মত কাঠের) পড়তেন।

রাজবংশী সমাজের বাড়িঘর সাধারণত খড়, ছন, বাঁশ দিয়েই তৈরি হত। বন্য জন্তুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেকে কাঠের দোতলা বাড়ি করত। বাঁশের প্ল্যাঙ্কিং করা ঘরের প্রচলন বেশি ছিল। বাঁশের মাচা তৈরি করেই শোয়ার বসার ব্যবস্থা হত। ছুতোরের অভাব ছিল বলে আস্ত শাল গাছ ব্যবহার করতে দেখা যেত। বিশেষ করে ঘরের খুঁটি, ধর্নার ক্ষেত্রে, বড় জোর একফালি দুইফালি করে নেওয়া হত হস্তচালিত করাত দিয়ে। তবে সেটা শুধুমাত্র তক্তার ক্ষেত্রেই দেখা যেত বেশি। বাঁশের ব্যবহারটাই মুখ্য ছিল। বাঁশ দিয়েই প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্র বানিয়ে নিত।এটা অবশ্য ইন্দোমঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যও বটে। কারণ এই গোষ্ঠীর মানুষজন প্রথমেই বাঁশের ব্যবহার আয়ত্ত করে। মহিলারা তাঁত চালাতে জানতেন । প্রবাদ আছে ‘হাজার টাকার কুচুনী তাও বান্দে বুকুনী’। অর্থাৎ মহিলাদের অন্যতম পোষাক ছিল বুকুনী। বিয়েতে উজ্জ্বল (লাল, হলুদ) রঙের পাটানী পড়ার রীতি ছিল। বিশেষ করে সইয্যাফুলি। বিয়ের সময় নিয়ম রীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত ‘বৈরাতী’। প্রতি গ্রামেই এক দু’জন এরকম মহিলা থাকতেন। এদের কাছ থেকেই পরবর্তী কেউ শিখে নিতেন। গ্রামের বয়স্কা মহিলাদের ছিল বিশেষ সম্মান। তারা গ্রামের মহিলাদের বিষয়-আশয়, ভালমন্দের খোঁজ রাখতেন। হাটে বাজারে কিংবা বিচার সালিশীতেও (বিশেষ মহিলা কেন্দ্রিক বিষয়ে) যেতেন। তারা মতামতও দিতেন। গহনাগাটির বহুল প্রকারভেদ ছিল। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ধরনের গহনা পড়ার প্রচলন ছিল। সোনা-রূপার গহনা বানানোর লোক বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত। দোকান পাট না থাকলেও এক শ্রেণির (বিহার থেকে) লোক এই কাজগুলি করতেন। রাজবংশী সমাজেরও অনেকে এই কাজ করতেন। তারা পরবর্তীকালে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। এরা ‘বানিয়া’ নাকে পরিচিতি পায়। তামার গহনাও প্রচলিত ছিল। নাক, কান, গলা, কোমর, হাত, পা-এর গহনার অজস্র প্রকারভেদ ছিল। গহনার কাজ করা ‘বানিয়া’, শাখারিয়ারা (যারা শাখার কাজও করতেন) তারাও রাজবংশী

সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছিল। এই গহনাগাটির মধ্যে রাজবংশী সমাজের নৃতাত্ত্বিক চিহ্ন কিংবা নন্দন তত্ত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতি থেকে পোকামাকড়ও বিভিন্ন নকশায় ধরা পড়ে। গান প্রবাদেও সেই গহনার কথা ধরা পড়েছে।[৫১]

না নাগে মোক জলটোপা নখ
না নাগে মোক কানের দুল
বৌদির বাদে আইনছে দাদা
কি সুন্দর ঝুমকা নাগা দুল।

গহনা নিয়ে এরকম অজস্র গান 'চোর চুরনি' গানেও গাওয়া হত —

চোরা আসছে পূজার বাজার
নাগে এই মন মোর চন্দ্রহার
দিনে দিনে দিন যাছে মোর, করেক তুই বিচার
ও নারীর উজানী বাহার।[৫২]

রাজবংশী সমাজের এই গহনা ও কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে ইন্দোমঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর (কোচ, হাজং, রাভা, বোড়ো) কাপড়-চোপড় ও অলংকারের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যা নৃতত্ত্বের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ।

কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী সংগঠিত হয় এটা যেমন ঠিক তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই রাজবংশী জনগোষ্ঠী দ্বিতীয়বার জাতি সত্ত্বার প্রশ্নে সংঘবদ্ধ হয়। এই সময়েই নেতৃত্বে উঠে আসেন মনীষী পঞ্চানন বর্মা। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে এই জনগোষ্ঠী জাতিসত্তা ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় প্রদানকে ঘিরে বিতর্ক দেখা দেয় এবং রাজবংশী ক্ষত্রিয় ও বর্ণহিন্দুদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদাগত ব্যবধান সৃষ্টি হয়। রাজবংশীর সমাজের ক্ষত্রিয় দাবিকে বর্ণহিন্দুরা বিশেষত জমিদার ও উকিল, মোক্তারেরা প্রবল বিরোধিতা করে। বর্ণহিন্দুদের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামিই এই সমস্যার মূলে কাজ করে এবং রাজবংশী সমাজ তথা নব্য হিন্দুদের উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্তি নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়। তথাকথিত বর্ণহিন্দুরা রাজবংশীদের নিম্নবর্গীয় হিন্দু এমনকী ম্লেচ্ছ বলেও প্রতিপন্ন করেন। তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন

কিংবা মেলামেশায় অনীহা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে প্রকাশিত ‘বিশ্বকোষ’ গ্রন্থে শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু রাজবংশী হিন্দুদের ‘বর্বর’ ও ‘ম্লেচ্ছ’ বলে উল্লেখ করেন।[৫৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে; এবং এই আন্দোলন গতি লাভ করে ঐ শতকের শেষ দশকে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারিতে রাজবংশীদের কোচ হিসাবে গণনা করা হলে রাজবংশীদের মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের গণনায় কর্তৃপক্ষ পুনরায় রাজবংশীদের কোচ হিসাবে গণনার নির্দেশ দিলে রাজবংশীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং আন্দোলন আরও গতিপ্রাপ্ত হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি রাজবংশী নেতৃবর্গ সরকারি নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করেন। ১০ ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। সেখানে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের স্বীকৃতি আদায়সহ কোচদের থেকে তাদের আলাদাভাবে রাজবংশী হিসাবে গণনার দাবী ওঠে। এই দাবীর প্রেক্ষিতে রংপুরের জেলা প্রশাসক ধর্মসভার মতামত আহ্বান করলে রংপুর ইটাকুমারীর পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নকে ধর্মসভার পক্ষ থেকে মতামত জানানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়। তর্করত্ন মহাশয় এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে উত্তরবাংলার রাজবংশীগণ বুৎপত্তিগত দিক থেকে ক্ষত্রিয় এবং তারা অবশ্যই ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতযোগ্য। কিন্তু এই দাবির সপক্ষে কোনো বৈদিক, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসক এক আদেশের মাধ্যমে রাজবংশীদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হিসাবে ফিরিয়ে এনে আদমসুমারিতে স্থান দেবেন বলে আদেশ জারি করলেও ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির প্রতিবেদনে রাজবংশী ক্ষত্রিয় মর্যাদা পাননি। পাশাপাশি সে সময় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার প্রাথমিক অবস্থায় সেন্সাস আদেশ সূত্রে রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের ‘রাজবংশী’ বলে উল্লেখ করা হয়। রাজবংশী ক্ষত্রিয় নেতৃবর্গ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে তীব্র আপত্তি জানানোর পরেও ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির চূড়ান্ত রিপোর্টে রাজবংশী ও কোচ অভিন্ন জাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয় না। এর ফলে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ক্ষাত্র আন্দোলনের প্রসার ঘটতে থাকে। নেতৃত্বে উঠে আসেন পঞ্চানন বর্মা। তিনি উপলব্ধি করেন রাজবংশীদের সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন আছে। তার আগেই জাতির উন্নতিকল্পে বাংলাদেশের জমিদার হরিমোহন রায় খাজাঞ্চীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ‘ব্রাত্য রংপুর ক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি

বিধায়সী সভা'। তিনি রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় পরিচয় বিষয়ে কামরূপ ও রংপুরের পণ্ডিত সমাজের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৪] পরবর্তীকালে রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে রংপুরে 'ক্ষত্রিয় সমিতি' গঠিত হয় ১৯১০ সালে। ক্ষত্রিয় সমিতির মাধ্যমে ক্ষত্রিয় আন্দোলন সমগ্র উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে (রংপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ)। এই সময়ে রাজবংশীদের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য,[৫৫] ঐতিহ্য উদ্ধারের জোয়ার আসে। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৭ মাঘ পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জে করতোয়া নদীর তীরে রাজবংশী নেতৃবর্গ 'ক্ষত্রিয়' হিসাবে উপবীত ধারণ করেন। 'উপবীত' গ্রহণ রাজবংশীদের কাছে ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রতীক স্বরূপ গৃহীত হয়। উপবীত গ্রহণ করে রাজবংশীরা দাস, সরকার ইত্যাদি পদবি ত্যাগ করে বর্মন, বর্মা, রায়, সিংহ পদবি গ্রহণ করতে থাকে। বলা যায় এই পদবি গ্রহণের মধ্য দিয়ে কোচ, খেন, পলিয়ারাও রাজবংশী সমাজের সঙ্গে সামিল হয়। এছাড়াও বর্ণহিন্দুদের মত কিছু সংস্কার যেমন বাল্যবিবাহ, পর্দা প্রথা ইত্যাদির প্রচলন করেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার রীতি শুরু হয়।[৫৬] সেই সঙ্গে মৃতের সৎকারের অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে ৩০ দিনের পরিবর্তে ১২ দিনের বিধান তৈরি করে।[৫৭] সমাজে নিত্য পূজা, সন্ধ্যা আহ্নিক, গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ, গীতাপাঠ ইত্যাদি শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয় সমিতি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে ঘরে ঘরে বিতরণ করে। ধর্মীয় সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে পঞ্চানন বর্মার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শক্তির প্রতীক হিসাবে 'চণ্ডী পূজার' প্রচলন শুরু হয়।[৫৮] ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলনের ফলে রাজবংশী সমাজে ব্যাপক সংখ্যায় উপবীত ধারণ শুরু হয় এবং সবাই 'কাশ্যপ' গোত্র ধারণ করে। কিন্তু বর্ণহিন্দু আইন অনুযায়ী রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব নিয়ে আবারও বিতর্ক ওঠে, বলা হয় রাজবংশীদের বিয়ে হিন্দু আইন অনুযায়ী ক্ষত্রিয় বিয়ে নয়। কারণ হিসাবে বলা হয় রাজবংশীদের মধ্যে গোত্র বিভাজন নেই। ক্ষত্রিয় হিসেবে বিয়ের ক্ষেত্রে এই গোত্র বিভাজন জরুরি। তখন কলকাতা হাইকোর্টের এক রুল জারির মধ্যে দিয়ে শাণ্ডিল্য, পরাশর, গৌতম, কপিল, ভরদ্বাজ, কৌশিক প্রভৃতি বারোটি গোত্র নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।[৫৯] যদিও রাজবংশী সমাজ এ যাবৎ কাল একটিমাত্র গোত্র 'কাশ্যপ' হিসাবেই পরিচয় দেয় এবং স্বগোত্রেও বিয়ে প্রচলিত। গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই বিয়ের বিষয়টি সম্পন্ন হয়।[৬০]

ক্ষত্রিয় সমিতির ক্ষাত্র আন্দোলন ও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি বর্ণ হিন্দু সমাজ মেনে নিতে পারেননি।

তারা প্রথম থেকে বিরোধিতায় নামেন। কারণ তাদের মতে রাজবংশী সমাজ ‘ম্লেচ্ছ’ ও ‘অন্তজ’। তার ফলে পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। লক্ষ করা যায় জমিদার, উকিল, মোক্তার, পণ্ডিত ছাড়াও কোচবিহার রাজদরবারের উচ্চপদস্থ আমলা ও অনেক সরকারি কর্মকর্তাগণও বিরোধিতা করতে থাকেন। উপবীত ধারণের মহামিলনকে পণ্ড করার চেষ্টাও হয়েছে। এমনকী কোথাও কোথাও ক্ষত্রিয় মহামিলনের কেন্দ্র থেকে আদায়ীকৃত অর্থ জোর করে সরকারি কোষাগারে জমা করার নির্দেশ জারি হয়।[৬১] রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি রাজবংশীদের পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে ক্ষত্রিয় মর্যাদা স্বীকৃতির জন্য প্রতিটি জেলায় জেলা শাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং আদমসুমারি কমিশনের নিকটও স্মারকলিপি প্রদান করেন। অনেক টালবাহানার পর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির রিপোর্টে রাজবংশীর পৃথক জাতি ও রাজবংশী ক্ষত্রিয় লেখার অনুমতি পায়।[৬২] কিন্তু রাজবংশীদের পৃথক ক্ষত্রিয় জাতি হিসাবে পরিচয় লাভের জন্য ক্ষত্রিয় সমিতি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ও ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি অবধি আন্দোলন আরো তীব্রতর করে তোলে।[৬৩] তবে একথা বলা যায় তৎকালীন কোচবিহার দেশীয় রাজ্য ছাড়াও অন্যত্র পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলন বেশ সাড়া জাগায়। অবশেষে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি রিপোর্টে রাজবংশীদের রাজবংশী ক্ষত্রিয়র পরিবর্তে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। উল্লেখ্য একসময় উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে অন্যান্য ধর্মের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। সেই সময় পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলন রাজবংশীদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। এখানেই পঞ্চানন বর্মার কৃতিত্ব।[৬৪] তিনি নতুন করে রাজবংশী সমাজকে সংঘবদ্ধ করে জাতি সত্তার প্রশ্নে, সমাজ ধর্মের ক্ষেত্রে রাজবংশী সমাজকে নতুন করে দ্বিতীয় বার প্রতিষ্ঠা করেন।

পঞ্চানন বর্মার ক্ষাত্র আন্দোলনের অভিমুখ একমুখী ছিল না। সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুরক্ষা, জীবন-জীবিকার প্রসার ও উন্নতি, নারীর সম্মান রক্ষা, শিক্ষার প্রসার সর্বোপরি সম্প্রীতি রক্ষা করা এবংবিধ বিষয়গুলি ক্ষাত্র আন্দোলনে প্রাধান্য পায়। পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। ‘ক্ষত্রিয় ব্যাঙ্ক’ প্রতিষ্ঠা করে যেমন তিনি গরিব চাষিদের স্বল্প সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করে সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আবার আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ

সচেতন ছিলেন। তাই ক্ষত্রিয় মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রাগ্রসর এবং সুরক্ষিত করার স্বার্থে রাজবংশী সমাজকে 'সংরক্ষণ' তালিকাভুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হন। অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও (বঙ্গীয় ব্রাহ্ম সমাজ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, দি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু সভা প্রভৃতি সংগঠন তীব্র বিরোধিতার নামে) তিনি চেষ্টা চালিয়ে যান। অবশেষে তিনি সফল হন। বলা যেতে পারে একমাত্র তাঁর চেষ্টাতেই অবশেষে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে তপশিলী জাতির তালিকা প্রকাশিত হলে রাজবংশীরা এই তালিকা অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬৫] স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধানের ৩৪১ নং ধারায় এবং ১৯৫১ ও ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের আদেশনামায় রাজবংশীরা পশ্চিমবাংলায় 'Scheduled Caste' তালিকায় থেকে যায়।[৬৬] এর ফলে রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলেও রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী জাতির আর্থসামাজিক উন্নতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছিলেন। জাতির মর্যাদার থেকে তাঁর কাছে জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নতিই ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই তালিকার অন্তর্ভুক্তির ফলে পিছিয়ে পড়া রাজবংশীরা সংরক্ষিত তালিকার সুযোগ সুবিধা লাভ করেন। এর জন্য রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী সমাজের মধ্যেই তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার যুক্তি ছিল — "Without protection and reservation in politics, education and administration, a backward caste could not improve its social position." এই তালিকা থেকে রাজবংশীরা বাদ পড়লে এই সম্প্রদায়ের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। অবশেষে তিনি রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির সদস্যদের নিজ সমর্থনে আনতে পেরেছিলেন।[৬৭]

রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী জাতিকে সংস্কারমুখী করার উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয় সমিতির সংগঠনকে ঢেলে সাজান এবং সংগঠনকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন। সমিতির কাজকর্ম ও বিধিব্যবস্থা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে দিতে 'প্রচারক' নিয়োগ করা হয়।[৬৮] পরামর্শ দেওয়ার জন্য ক্ষত্রিয় সমিতি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজবংশী কৃষকদের সাহায্যের জন্য রংপুরে একটি 'ক্ষত্রিয় ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এভাবে ক্ষত্রিয় সমিতি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সংস্কার আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।[৬৯] কৃষকদের সাথে সাথে ছাত্র সমাজকেও সংস্কার আন্দোলনে সামিল করতে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে 'ক্ষত্রিয় ছাত্র সমিতি' প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৭০] রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার সমাজ চিন্তার দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত মেলে তার কর্মধারায়। তিনি শিক্ষার

বিস্তারে যেমন সচেতন ছিলেন তেমনি দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য প্রকল্পে একটি 'সাধারণ অর্থভাণ্ডার' ও 'অর্থনৈতিক কোম্পানি' যা বর্মা কোম্পানি নামে পরিচিত ছিল। দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য করাই ছিল এই অর্থভাণ্ডার ও কোম্পানির মূল লক্ষ্য।[৭১] শিক্ষার প্রতি রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার ছিল গভীর অনুরাগ, তাঁর কর্মভাবনার মধ্যে তা প্রকাশ পেয়েছে। ক্ষত্রিয় সমিতির পঞ্চম বার্ষিক সম্মিলনীয় কার্যবিবরণীতে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিদানের উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা ছিল পঞ্চানন বর্মার দূরদৃষ্টি এবং সুদূরপ্রসারী ভাবনা। শিক্ষার প্রসারে তিনি যেমন ক্ষত্রিয় সমিতিকে উদ্যোগী করেন তেমনি সাহায্যের জন্য জমিদার বর্গ ও সরকারি প্রতিনিধিদের কাছেও সাহায্যের জন্য ছুটে যান। ছাত্রাবাস নির্মাণের পাশাপাশি সামাজিক শিক্ষা, নীতি শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে একমাত্র শিক্ষার মধ্য দিয়ে রাজবংশী জাতির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব। অন্যথায় নয়। তাই শিক্ষা বিষয়ে প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য তিনি ক্ষত্রিয় সভায় বলেন — "আপাতত দেখা যাইতেছে যে আমাদের সমাজ অশিক্ষিত। আমাদের পূর্বপুরুষগণ বিদ্যাশিক্ষার স্থান ও ব্যক্তির আপন আপন সন্তান-সন্ততিদিগের উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করাইতে পারেন নাই। উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা না হইলে মানুষের মনুষত্ব জন্মে না।"[৭২] সমাজকে সুশিক্ষিত করে উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক বিকাশই ছিল পঞ্চানন বর্মার মূল লক্ষ্য। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়েই সমাজ ও জাতির উন্নতি সম্ভব।

পঞ্চানন বর্মা শুধু শিক্ষার প্রসারের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না নারীর নিরাপত্তা, নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলবার বিষয়েও সচেতন ছিলেন। সে জন্য তিনি ক্ষত্রিয় সমিতির পক্ষ থেকে 'নারী রক্ষা বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৩] দুঃস্থ নির্যাতিতা মহিলাদের উদ্ধার করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য লাঠিখেলা, ছোরা খেলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। নারীর আত্মসম্মানবোধ ও চেতনা জাগরণের জন্য তিনি 'ডাংধরী মাও' কবিতা রচনা করেন ও সমাজের সকলের কাছে বিতরণ করেন।[৭৪] এভাবে পঞ্চানন বর্মার প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের মহিলারাই অপমান থেকে রক্ষা পান নাই অন্য সম্প্রদায়ের মহিলারাও রক্ষা পেয়েছিলেন।[৭৫] এ প্রসঙ্গে মনীষী পঞ্চানন বর্মার বাণী[৭৬] সম্প্রীতিরও বার্তা দিয়েছেন —

হিন্দু মুসলমান বিচার নাইরে —
মানুষজন তো নয় ভিন,
উলসি ধায়া আর্তের উদ্ধার
এই ক্ষত্রিয়ের চিন।

পঞ্চানন বর্মা তার 'ডাংধরী মাও' কবিতার মাধ্যমে ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে জাগরণের চেষ্টাই করেছিলেন।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পঞ্চানন বর্মা ইংরেজ সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ক্ষত্রিয় রেজিমেন্ট গঠন করে রাজবংশীদের সৈন্য বাহিনিতে যোগদানে উৎসাহিত করেন। সরকারের কাছেও 'ক্ষত্রিয় রেজিমেন্ট' গঠনের আর্জি জানান।[৭৭] সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ আসলে পঞ্চানন বর্মার আহ্বানে সাড়া দিয়ে জলপাইগুড়ি, রংপুর, আসাম, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলের ৪০০ জন রাজবংশী যুবক সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন।[৭৮] আসলে পঞ্চানন বর্মা সেদিন ক্ষত্রিয় শৌর্যকে কাজে লাগিয়ে একটি বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন ও জাতিগত পেশার স্বীকৃতি দানের চেষ্টায় ছিলেন। প্রথমটি হল রাজবংশীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করা, অন্যটি হল ক্ষত্রিয় শৌর্য বা ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন। দেশরক্ষা করা বা যুদ্ধ করা ক্ষাত্র ধর্মের পরিচয় এই ঐতিহাসিক সত্যদ্বয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এইখানেই ছিল রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার দূরদর্শিতা।[৭৯]

কৃষক সমাজ নিয়েও তাঁর চিন্তা ও কর্মভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। কৃষক ও জমি সম্পর্কিত বিষয়টিকে তিনি শুধু দায়বদ্ধতার বিষয় হিসাবে ভাবেননি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রাজবংশী সমাজজীবনকে উন্নত করতে হলে প্রথমেই কৃষি অর্থনীতির উন্নতি আবশ্যক শুধু জরুরি নয়, কৃষক সমাজের সমস্যা, ভূমির স্বত্ত, চাষবাস, উন্নতি ইত্যাদি বিষয়গুলিও জরুরি। তাই তাঁর পরবর্তী কর্মজীবনে বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে কর্মধারায় সেটা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন। কাউন্সিলের সদস্য (১৯২০ খ্রি:) নির্বাচিত হয়েই তিনি দরিদ্র ও শোষিত কৃষক কূলের দারিদ্র্য, দুঃখ কষ্ট দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করেন। ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন সংশোধন করতে উদ্যোগী হন। পূর্বে ভূমিতে প্রজাগণের কোনো স্বত্ত্ব ছিল না। জমিদারগণ খুশিমত জমি থেকে প্রজাদের উচ্ছেদ করতেন, প্রজাদের জমির হস্তান্তর, জমির উপর পাকা

গৃহনির্মাণ, ইদারা খনন, বৃক্ষচ্ছেদন প্রভৃতির অধিকার ছিল না। প্রজাদের এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তিনি সর্বাগ্রে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন।[৮০] কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রাজবংশী ক্ষত্রিয়ের সিংহভাগই কৃষক। সমাজ সংস্কৃতির উন্নতির সোপান হিসাবে কৃষির উন্নতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে তিনি মনে করতেন। তিনি কৃষকদের পাশে থেকে তাঁর কর্মজীবনকে ব্যাপ্ত করেছিলেন। তিনি কৃষক সমাজকে সংগঠিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। তাঁর আগে কৃষকদের স্বার্থে ব্যক্তিগত কিংবা সাংগঠনিকভাবে কেউ তাঁর মত করে এগিয়ে আসেননি। সেক্ষেত্রে তাকে কৃষক নেতা হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে এবং বলা যেতে পারে তিনিই ছিলেন বাংলার কৃষক আন্দোলনের আদিপুরুষ।

স্বাভাবিকভাবে বলা যায় তিনি সমগ্র রাজবংশী সমাজকে নতুনভাবে সংগঠিত করেন ক্ষত্রিয় সমিতির মাধ্যমে। রাজবংশী সমাজের সমাজ সংস্কৃতি এই সময়ে নতুনভাবে আবর্তিত হয়। রাজবংশী সমাজের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন তিনি। জাতি সত্তার পরিচয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে আচরিত ধর্মবিশ্বাস, সংস্কারের প্রয়াসে তিনি আজীবন লড়াই চালিয়ে গেছেন। রাজবংশী সমাজ পরিবারের ভেতর থেকে উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের সোপানকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আজকের রাজবংশী সমাজের কাঠামো তার ভাবনার উপরই প্রতিষ্ঠিত। উত্তরবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতি চর্চা তথা রাজবংশী সমাজজীবন নিয়ে আলোচনায় পঞ্চানন বর্মা তাই শুধু একটি নাম নয় বলা যেতে পারে প্রাণপুরুষ। তিনিই সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে চিহ্নিত। তিনিই প্রথম উত্তরবঙ্গের ভাষা, সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব তথা ঐতিহ্য নিয়ে উদ্যোগী হন। রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি তো বটেই তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তা চেতনায় অন্যান্য জনগোষ্ঠীও সমৃদ্ধ হয়েছে, সংগঠিত হয়েছে। সেখানে ক্ষত্রিয় সমিতি একটি নাম এবং পঞ্চানন বর্মা তার ফলক। পঞ্চানন বর্মা এই নামকে ছাপিয়ে আজও একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ; কোচবিহার রাজ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কমিশনারদের ভূমিকা ও কার্যাবলী (১৭৮৯-১৮৬১) ইতিহাস অনুসন্ধান ১১, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেট, কলকাতা, ১৯৯৬ পৃষ্ঠা - ৪৯৩

২. পাল, নৃপেন্দ্রনাথ; কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা ২০০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প: ব: পৃষ্ঠা - ১১

৩. সেন, পার্থ; কোচবিহার ভুটান সম্পর্ক (১৭৯২-১৮০১) এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকা একটি পর্যালোচনা, ইতিহাস অনুসন্ধান ১৬, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০০২ পৃষ্ঠা - ৪১৫

৪. Ghosh, J. M.; Sanyasi and Fakir Raiders in Bengal, Calcutta, 1930 Page - 70-82

৫. খান চৌধুরী, আমানতউল্লা আহমেদ; কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খণ্ড), রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (প্রকাশক), মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কল - ৭৩, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ৩৭৪-৩৭৬

৬. চৌধুরী, হরেন্দ্রনারায়ণ; অনুবাদক পাল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ, রাজ্য কোচবিহারের রাজকাহিনী (দ্বিতীয় খণ্ড), অণিমা প্রকাশনী, কল - ৯, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১৩৫

৭. লাহিড়ী, রেবতী মোহন; জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ-1869-1968, ১৯৭০ জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস (প্রবন্ধ) পৃষ্ঠা - ৭

৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ১০

৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১

১০. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১

১১. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৮

১২. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৮

১৩. ঘোষ, আনন্দ গোপাল; নির্মল চন্দ্র রায় (সম্পাদিত) ১৯৪৭ - পরবর্তী উত্তরবঙ্গ, উত্তরবঙ্গে বিভাগীয় প্রশাসনিক কাঠামোর সূচনা ও বিকাশ : প্রসঙ্গ রাজশাহী থেকে প্রেসিডেন্সি, জলপাইগুড়ি বিভাগ (১৮২৯-১৯২৩) আনন্দগোপাল ঘোষ। সংবেদন, মালদা, ২০১৪ পৃষ্ঠা - ১৪

১৪. সূত্রধর, কার্তিক চন্দ্র; সমাজ ধর্ম অর্থনীতি, সংবেদন, বি এস রোড, মালদহ, ২০১৩

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৪

১৬. ঘোষ, আনন্দগোপাল; ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ (প্রবন্ধ সংকলন) সরকার, অসীম কুমার; সংবেদন, বি এস রোড, মালদহ, ২০১১, পৃষ্ঠা - ১৪

১৭. রায় চৌধুরী, তাপস; ডুয়ার্সে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিবর্তন, মধুপর্ণী, বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

সূত্রধর, কার্তিক চন্দ্র; সমাজ ধর্ম অর্থনীতি, সংবেদন, বি এস রোড, মালদহ, পৃষ্ঠা - ২৫

১৮. সূত্রধর, কার্তিক চন্দ্র; মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ও তাদের ভূমিকা (উপনিবেশ পর্ব) : প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, বি এস রোড, মালদহ, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১১৮

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১৫

২০. সাক্ষাৎকার - আনন্দগোপাল ঘোষ। ১৩.৩.২০১৬

২১. Ray, Subhajyoti; Transformation on the Bengal Frontier, Jalpaiguri, London, 2002.

২২. সূত্রধর, কার্তিক চন্দ্র; ঐ, পৃষ্ঠা - ১১৬

২৩. ঘোষ, আনন্দগোপাল; ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, মালদহ, ২০১১, পৃষ্ঠা - ১৬

২৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৮

২৫. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৬৬

২৬. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৩৯

২৭. সূত্রধর, কার্তিক চন্দ্র; সমাজ, ধর্ম ও অর্থনীতি : প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, মালদহ, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১৩৩

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৪৫

২৯. Chowdhury, N.; CoochBehar State and its Land Revenue settlements, P - 317

৩০. Kushari, Abani Mohan; el, West Bengal District Gazetteers, Jalpaiguri, July 1981. P - 254

৩১. Ibid, Page - 261

৩২. Strong, F. W.; Eastern Bengal District Gazetteers, Dinajpur First Published 1912, Page - 152

৩৩. Lambourn, G E; Bengal District Gazetteers Malda, First Published 1819, P - 89

৩৪. গ্রুনিং, জে এফ; ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ারস, জলপাইগুড়ি, পৃষ্ঠা - ২০০৮

৩৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ৪২

৩৬. হান্টার, ডব্লিউ. ডব্লিউ.; স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ভলিউম - X, দিল্লী, ১৮৭৪, ২৫২-২৬১, পৃষ্ঠা - ৪২-৪৩

৩৭. Sanyal, Charuchandra; The Rajbanshis of North Bengal, Kol - 1965, Page - 20

৩৮. ঘোষ, আনন্দগোপাল; সরকার, অসীম কুমার; ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ (সম্পাদনা), উপনিবেশিক শাসনপর্বে জলপাইগুড়ি জেলার গ্রাম সমাজ, সংবেদন, মালদহ, ২০১১, পৃষ্ঠা - ৬১

৩৯. Hunter, W. W.; Statistical Accounts of West Bengal, Vol X, Delhi - 1874 Page - 257

৪০. Sanyal, Charuchandra; The Rajbanshis of North Bengal, Kolkata, 1965, Page 22-22

৪১. Gruning, G. F; Eastern Bengal and Assam District Gazetteers, Jalpaiguri, Alahabad 1911, rept. 2008, Page - 43

৪২. ঘোষ, আনন্দগোপাল; সরকার, অসীম কুমার; ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ (সম্পাদনা), উপনিবেশিক শাসনপর্বে জলপাইগুড়ি জেলার গ্রাম সমাজ (১৮৬৯-১৯৪৭), গৌরাঙ্গ চন্দ্র রায়, পৃষ্ঠা - ৬২

৪৩. Gruning, G F; Eastern Bengal and Assam District Gazetteers, Jalpaiguri, Alahabad, 1911

৪৪. Sunder's D. H. E.; Survey and Settlement of the Western Duars in the District Jalpaiguri, 1889-95

৪৫. সাক্ষাৎকার শ্রী রাজেন্দ্র নাথ দাস (৮০) বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৪.৪.২০০৫

৪৬. ঘোষ, আনন্দগোপাল; সরকার, অসীম কুমার; ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, মালদহ, ২০১১, পৃষ্ঠা - ৬৭

৪৭. মণ্ডল, তনয়; রাজবংশী লোক চিকিৎসা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প: ব: সরকার, ২০১১

৪৮. Sanyal, Charuchandra; The Rajbanshis of North Bengal, Page - 28

৪৯. রায়, দীপক কুমার; রাজবংশী সমাজ আরো সংস্কৃতির কাথা, সোপান, কল, ২০১২, পৃষ্ঠা - ৭১

৫০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৮৩

৫১. সান্যাল, চারুচন্দ্র; ঐ, পৃষ্ঠা - ৮৩

৫২. রায়, দীপক কুমার; ঐ, পৃষ্ঠা - ৭৪

৫৩. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, জলপাইগুড়ি, ১৯৪১ পৃষ্ঠা - ৮

৫৪. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, জলপাইগুড়ি, ১৯৪১ পৃষ্ঠা - ৮

৫৫. তদেব পৃষ্ঠা - ১৬

৫৬. ক্ষত্রিয় সমিতির বিত্ত বিবরণী, তৃতীয় বর্ষ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৩৬

৫৭. পাল, সমর; ‘জেলার আদিবাসী : নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়’, রঙপুর জেলার ইতিহাস (সম্পাদনা), জেলা প্রশাসন, রঙপুর, ২০০, পৃষ্ঠা - ১০০

৫৮. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; ক্ষত্রিয় সমিতির বিত্ত বিবরণী, অষ্টম বর্ষ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত, জলপাইগুড়ি, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, ১ম বর্ষ, সংবেদন, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৭৩-৮১

৫৯. ঘোষ, সুবোধ; ভারতের আদিবাসী (কলকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা. লি. ২০০০), পৃষ্ঠা - ২৩৬-২৩৭

৬০. বিশ্বাস, অশোক; বাংলাদেশের রাজবংশী : সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৩৬

৬১. ঐ, তৃতীয় বর্ষ বিত্ত বিবরণী, পৃষ্ঠা - ৩৬

৬২. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; 'ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত' জলপাইগুড়ি, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৮১০

৬৩. জি বি পলিটিক্যাল ফাইল নং 8A - 8B, ডিসেম্বর, ১৯৩১

৬৪. সান্যাল, চারুচন্দ্র; দি রাজবংশীজ অব নর্থবেঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৪, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পৃষ্ঠা - ১৯

৬৫. জি বি এ্যাপোট (রিফর্মস) ফাইল নং 1R - 2 অফ ১৯৩৩, এপ্রিল, ১৯৩৪, প্রসেডিংস নং ৯-৬১, সিরিয়াল নং ৫০

৬৬. অধিকারী, মাধব; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, (১ম খণ্ড), রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১০০

৬৭. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; 'ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত' জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৬৩

৬৮. বসু, স্বরাজ; অষ্টম বর্ষ কার্যবিবরণী, ক্ষত্রিয় সমিতি রংপুর, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত, পৃষ্ঠা ২৬-২৯, Dynamics of a caste movement (The Rajbanshis of North Bengal) 1910-1947, New Delhi, 2003, Page - 72-73

৬৯. Bandhopadhaya, Shekhar; Caste Politics and the Raj Bengal, 1872-1937, Kol - 1990 Page - 144-145

৭০. ক্ষত্রিয় সমিতি পত্রিকা, 'ক্ষত্রিয়' বৈশাখ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, পৃ: ২১-২২

৭১. ক্ষত্রিয় সমিতির ত্রয়োদশ রিপোর্ট, রংপুর, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৫-১৬

৭২. চতুর্থ সম্মিলনীয় কার্য বিবরণী ক্ষত্রিয় সমিতি, মনোহর বর্মা, ১৩২০

৭৩. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; 'ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত', জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৪২

৭৪. তদেব পৃষ্ঠা - ৫০-৫৪

৭৫. দ্য বেঙ্গল লেজিসনেটিভ কাউন্সিল প্রসেডিংস, ১৩ তম সেসন, খণ্ড নং ৮, ১৯২৩, পৃষ্ঠা - ৩৭২-৭৩

৭৬. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; 'ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত', জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৫২

৭৭. ক্ষত্রিয়, আষাঢ়, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ

৭৮. ক্ষত্রিয় সমিতির ১০ম বার্ষিক রিপোর্ট, রংপুর, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৯

৭৯. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা (১ম খণ্ড), রিডার্স ফোরাম, কল - ৭৫, ২০১৪ পৃষ্ঠা - ৯৮

৮০. তদেব পৃষ্ঠা - ১০৭